মায়ের আঁচলে ঘাসফড়িং

● শওকত সাদী

স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়। আমরা তখন ছোট। বাবার চাকরি সূত্রে আমরা থাকি রংপুরের নাগেশ্বরী উপজেলায়। যেখানে এক সময় নীলের চাষ হতো। বাবা চাকরি করতেন ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সার্কেল অফিসার। দোতলা যে বাড়িতে আমরা থাকতাম তার কয়েক গজ দূরে মিলিটারি ক্যাম্প। বাড়ির নিচতলায় বাবা তার অফিসের সেকেন্ড অফিসারকে থাকতে দিয়েছিলেন, যার বাড়ি পাকিস্তানি রাজাকার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ চলছে। পাশের মিলিটারি ক্যাম্পে আমাদের বাসা থেকে দেখা যেত। দেখা যেত হেলিকপ্টার নামছে উঠছে।

মা বেগম সামসুন্নাহারের সঙ্গে শওকত সাদী

আমরা চার ভাই-বোন কাছাকাছি বয়সের। বড় দু-বোন তারপর দুই ভাই আমিসহ। বাবার অফিস ছিল কাছে। সে সময় বাবা অফিসে যেতেন। তার কাছে গল্পের মতো শুনতাম মুক্তিযুদ্ধের গল্প। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট হওয়ার সুবাদে আমি সবসময় বাবা-মায়ের কাছ থেকে বেশি আদর পেতাম। বিশেষ করে মায়ের কাছ থেকে। তিনি সবসময় আগলে রাখতেন তার স্নেহের আঁচলে।

একদিন আমরা সবাই উইকেন্ডে লাঞ্চে খেতে বসেছি। রন্ধনশিল্পী আমার মা সবসময় পছন্দ করতেন খাবার পরিবেশন করতে। বাবা বললেন,

'আজ যার যার খাবার নিয়ে খাবে, সেলফ হেল্প করবে।'

মার অভ্যাস সবসময় খাবার বেড়ে দেয়া। বিশেষ করে আমি তার সঙ্গে খেতে বসলে তিনি সবসময় আমাকে খাবার তুলে দেন। সেদিন বাবার কথা শুনে মা আর খাবার বেড়ে দেননি। আমি বসে আছি মা কখন খাবার বেড়ে দেবেন। কিছুক্ষণ পরও যখন মা খাবার বেড়ে দিলেন না তখন আমি বাবাকে বললাম,

'বাবা, আমি সেলফ হেল্প কিনব।'

সেই বয়সে আমার ধারণা ছিল সেলফ হেল্প এমন কিছু যা দিয়ে খাবার এমনি এমনি পেটে চলে আসে। আমার তখনো সখ্য গড়ে ওঠেনি অক্ষরের সঙ্গে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোতে বাইরে যখন যুদ্ধ চলছে, দেশের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সেই সময়ে মা তার আঁচলের নিচে আমাদের আগলে রাখতেন। তার অকৃত্রিম ভালবাসার ভেতর আমার আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা। বেড়ে ওঠার এক দুরন্ত অশ্বারোহী যে জীবনে তার মায়ের অকৃত্রিম ভালবাসার স্বপ্নিল ক্যানভাস। আমি আমার মায়ের শাড়ির আঁচলে খুঁজতাম ঘাসফড়িং। লুকিয়ে থাকা রঙিন প্রজাপতি উড়ে যেত আদরের উঠোনে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মা নীল কমল, ঠাকুর মার ঝুলি, চরকায় চাঁদের বুড়ির সুতা কাটার গল্প বলত। দোতলার জানালা দিয়ে ভেসে আসত হাসনাহেনা ফুলের গন্ধ। মিলিটারি ব্যারাক থেকে ভেসে আসত বারুদের গন্ধ। যে চাঁদ আধখানা হয়ে পড়ে থাকত জানালার গ্রিলে। আমি অদ্ভুত চোখে দেখতাম চাঁদের বুড়ির ঘণ্টার পর ঘণ্টা চরকায় সুতা কাটার সম্মোহিত সেলুলয়েড।

একদিন আচমকা আমার জায়গায় আমার বড় ভাইয়ের স্থান হলো। বাসার ছাদের কার্নিশে, মিলিটারি ক্যাম্পের হেলিকপ্টার নামার দৃশ্য দেখতে গিয়ে আমার ভাই দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে তার ডান হাত ভেঙে ফেলেছে। চিবুক থেঁতলে গেছে। ডান হাতে ব্যান্ডেজ, নাকে নল লাগানো। কিছু খেতে পারে না। এমনিতে যুদ্ধের উত্তাল সময়। তার মধ্যে এই অবস্থা। চিকিৎসা সেবা পাওয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার। বাধ্য হয়ে আমার মায়ের কোল ছাড়তে হলো। মা আমার বড় ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত। দুপুরে লাঞ্চের সময় কেউ আর আমাকে খাইয়ে দেয় না। রাতে ঘুমানোর সময় কেউ আর আমাকে গল্প বলে না। আমি মায়ের চারপাশে ঘুর ঘুর করি। বড় ভাইয়ের অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে মা কিছুতেই আমাকে সময় দিতে পারছিল না।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন যায়। এক দিন আমার খুব অভিমান হলো। আমার সেই বয়সে মাথায় এলো বুঝি ব্যথা পেলে মা আমাকে কোলে নিয়ে খাওয়াবেন, গল্প বলবেন। একদিন অলস দুপুরে প্রচ-রোদ্দুরে সূর্যের অভিমান নিয়ে বাড়ির পাশে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম বাসার বাউন্ডারির পাশে পেঁপের গাছ। পেঁপে গাছের ডাল নরম হয় আমার জানা। আমি সেই অলস দুপুরে নিরাপত্তা কর্মীর চোখ গলিয়ে মাথার ওপর খাঁ খাঁ সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির প্রাচীরে দাঁড়িয়ে পেঁপে গাছের ডাল ধরে ঝুলে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পেঁপে গাছের ডাল ভেঙে নিচে। নিচে লাল পিঁপড়ার ঢিবি। আমার বাঁ হাতের কনুই কিছুটা কেটে গেল। পিঁপড়ার কামড়ে আমার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ফুলে গেল। মা এমনিতে বড় ভাইকে সামলাতে ব্যস্ত। যুদ্ধ চলছে। তারপর আবার আমি। আমি কাউকে বলিনি যে আমি ইচ্ছা করে ঝুলেছি। শিশুরা কেউ বুঝি তার নিরাপদ আশ্রয়ের জায়গাটা ছেড়ে দিতে চায় না।

আমার মা এখনো সেই ভালোবাসার বন্ধনে আগলে রেখেছেন আমাদের পরিবারকে। তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। ■